উপসংহার

আমরা রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটকগুলির আলোচনা করলাম। বাংলা নাট্যসাহিত্যের কোন কালপর্বে রামনারায়ণের নাটকগুলি রচিত হয় তা আমরা দেখেছি। আমরা প্রাপ্ত তথ্য থেকে রামনারায়ণের মানসিকতার পরিচয়ও নিয়েছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাঁর নাটকগুলির বিশ্লেষণ করে তাঁর নাটকের শক্তি ও দুর্বলতা অন্বেষণ করেছি। এখন সামগ্রিক ভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যে রামনারায়ণ তর্করত্নের গুরুত্ব সম্পর্কে দু একটি কথা বলা দরকার।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয় রামনারায়ণের নাটকগুলির প্রধান ধর্মই হল তাদের অভিনয় গুণ। তিনি সাহিত্যগুণের সঙ্গে অভিনয়ধর্মকে মিলিয়েছেন। রামনারায়ণের আগে যাঁরা নাটক লিখতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের অনেকেই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তাঁরা কেউ কেউ বাংলা নাটকে বিয়োগান্ত পরিণতি এনে নূতনত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। হরচন্দ্র ঘোষ শেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদ করেছিলেন আবার মৌলিক নাটকও লিখেছিলেন। তিনি যথেষ্ট শ্রম সহকারে এবং সমকালীন রুচির কথা মনে রেখে নাটক লিখেছিলেন[১] কিন্তু মঞ্চে তাদের কোনোটিরই অভিনয় হয়নি। অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন — "তাঁহার নাট্যাবলী দেশের মধ্যে কোনো সাড়া ও প্রভাব আনতে পারে নাই। বাংলা নাটকের ইতিহাসে তার মূল্য বেশী নহে।[২] সুতরাং বলা যায় আদিপর্বের বাংলা নাটকের অভিনয়যোগ্যতা ছিল না। রামনারায়ণের নাটকেই প্রথম এই গুণটি পাওয়া গেল। তাঁর প্রথম নাটক একটি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে রচিত হয়। যখন তিনি এই নাটকটি রচনা করেন তখন বাংলা নাটকের কোনো রচনা ভঙ্গি বা আদর্শ নির্দিষ্ট হয়নি। রামনারায়ণকে নিজের পথ রচনা করতে হয়েছে। তিনি সংস্কৃত শিক্ষিত মানুষ। ইংরেজি নাট্যাদর্শ তাঁর তেমন জানা ছিল না। ফলে প্রথম নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব' থেকেই তিনি সংস্কৃত নাট্যজ্ঞানের উপর নির্ভর করে চলেছেন। ক্রমে তিনি সংস্কৃত নাটকের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন এবং নাটকগুলিকে উত্তরোত্তর অভিনয় গুণে বিশিষ্ট করে তুলেছেন। তাঁর 'কুলীন কুলসর্বস্ব' একাধিকবার অভিনীত হয়েছিল। 'নবনাটক'ও বহুবার অভিনীত হয়। 'রত্নাবলী', 'রুক্মিণীহরণ'ও অনেকবার অভিনয় হয়েছিল। নাটককে অভিনয়যোগ্য করে তোলবার জন্য তাঁর চেষ্টার কথা তাঁর নাটকের কোনো কোনো ভূমিকায় পাওয়া যায়। 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকের ভূমিকায় তিনি বলেছেন — "নাটক অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে অনেক রসভাবাদি পরিবর্ত্তিত, পরিত্যক্ত ও সন্নিবেশিত করিয়াছি।" আবার 'বেণীসংহার' নাটকের দ্বিতীয় সংস্কারের বিজ্ঞাপনে লিখেছেন — "অভিনয়য়োপযোগী করিবার নিমিত্ত এবার অনেক পরিবর্ত্তন করিলাম এবং তাদৃশ প্রয়োজন

নাই বলিয়া আখ্যায়িকাটি পরিত্যাগ করিলাম।'' 'রত্নাবলী' নাটকের ভূমিকায় এ বিষয়ে আরও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন —

> রত্নাবলী নাটকের অবিকল অনুবাদ করণে ক্ষান্ত থাকিয়া মূল গ্রন্থের স্থূলমর্ম্ম গ্রহণ করা গেল; এবং কথোপকথনে এতদ্দেশে যেরূপ ভাষা সচরাচর প্রচলিত আছে তাহাই অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিলাম, তাহাতে স্থানে স্থানে কিয়দংশে পরিত্যক্ত ও স্থানে স্থানে কোনো কোনো ভাব পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ এই ক্ষণে নাটকাভিনয় বিষয়ে যে অনেকেরই ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, তাহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত থাকায় এ গ্রন্থ তদুপযোগী করণ মানসে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি, এবং তন্নিমিত্ত শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল চৌধুরী মহোদয় দ্বারা কতিপয় সঙ্গীতও সংগ্রহ করিয়া স্থান বিশেষে যোজনা করা গিয়াছে।

এসব উক্তি থেকে বোঝা যায় রামনারায়ণ নাটককে অভিনয়যোগ্য করে তোলবার জন্য কতটা আগ্রহী ছিলেন। এখান থেকে আরও জানা যায় তিনি অনুবাদ নাটকে মূলের কোনো কোনো অংশ পরিবর্তন করেছেন, কোনো কোনো অংশ পরিবর্জন করেছেন। আবার কিছু কিছু নতুন বিষয় সংযোজন করেছেন। বোঝা যায় অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করা যে সহজ নয় তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। নাটককে অভিনয়যোগ্য করবার জন্য অনেক জিনিস তাতে বলা যায় না। তাই তিনি সে সব বিষয় বর্জন করেছেন। মনে হয় এই পরিবর্তন পরিবর্জনের পিছনে কাজ করেছে যুগের দর্শকদের রুচি বা প্রবণতা। রামনারায়ণ বিশেষভাবে যুগ সচেতন ছিলেন। তাঁর অন্যান্য শ্রেণীর নাটগুলির মধ্যেও এই যুগসচেতন মনের পরিচয় আছে। রামনারায়ণ জানতেন নাটক অভিনয়যোগ্য করবার জন্য তার সংলাপের শক্তি আবিষ্কার করতে হয়। 'রত্নাবলী'র ভূমিকায় তিনি সেকথা বলেছিলেন — ''এতদ্দেশে কথোপকথনের যেরূপ ভাষা প্রচলিত আছে'' সেই ভাষাতেই নাটকের সংলাপ রচনা করেছেন। এ থেকে রামনারায়ণের যুগ সচেতন মনের এবং নাটক সংলাপ রচনা কৌশলেরও পরিচয় পরিস্ফুট হয়। রামনারায়ণ নাটককে অভিনয় উপযোগী করে তোলার জন্য তাতে সঙ্গীত যোজনার কথা বলেছেন। তিনি সঙ্গীতকে নাটকের রস সৌন্দর্যের উপযোগীও ভেবেছিলেন। তাই বলা যায় বাংলা নাটককে অভিনয়যোগ্য করে তোলা তাঁর একটি বড় ভূমিকা।

ভাল নাটকের একটা বড় বৈশিষ্ট্যই যুগ চেতনা বা সমকাল সম্বন্ধে সচেতনতা। রামনারায়ণের আগে সমাজ সচেতন রচনার উদাহরণ তেমন নেই। তাঁর 'কুলীন কুলসর্বস্ব' যে বছর প্রকাশিত হয় সে বছর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' এবং তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী'র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সে বছর প্যারীচাঁদ এবং রাধানাথ শিকদার 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি কাগজ প্রকাশ করেন। কিন্তু 'আলালের ঘরে দুলাল' এর চার বছর পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল। আর কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' আরও চার বছর পরে ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হয়। সেদিক থেকে বলা যায় রামনারায়ণ প্রথম বাংলা সাহিত্যের সমাজ সচেতন নাট্যকার। তিনি 'কুলীন কুলসর্বস্ব', 'নবনাটক' এবং প্রহসনগুলিতে

সমকালের কয়েকটি সমস্যাকে যেভাবে উদঘাটিত করেছেন তাতে তাঁকে এই সমাজ সচেতন নাট্যকার নামে অভিহিত করতেই হয়। অবশ্য ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নক্‌শাগুলি তাঁর আগেই লেখা হয়েছিল। কিন্তু এখানে দুটি জিনিস মনে রাখতে হবে। প্রথমত, রামনারায়রের যুগে বিদ্যাসাগরের অনুগামী একদল মানুষ কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ এবং লাম্পট্য দোষের প্রতিবিধান কল্পে কাজ করছিলেন। রামনারায়ণ ছিলেন সেই প্রগতিশীল চেতনার অনুগামী। কিন্তু আর একটি কথাও এক্ষেত্রে বিচার্য। রামনারায়ণ যে দুটি সমাজ সম্পর্কিত নাটক লিখেছেন সে দুটি নাটকই অন্যে দ্বারা নির্দেশিত বিষয় নিয়ে লেখা। সুতরাং এ বিষয়ে রামনারায়ণের স্বাধীন কর্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না। মনে হয় তিনি নিজে সমাজ সম্বন্ধে যেন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। সেই কারণে তিনি ১৮৫৪ সালে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' লেখার পর এগার বছর আর কোনো সামাজিক বিষয় নিয়ে লেখেননি। বরং এমন সব সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেছেন, যেগুলি সেকালের পৃষ্ঠপোষকদের সেই শ্রেণীর রুচির অনুকূল ছিল। সুতরাং একটা দ্বিধা তাঁর ছিল বলেই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। রামনারায়ণের নাটকের একটা বিষয় তৎকালীন হিন্দু সমাজের কৌলীন্য, লাম্পট্য এবং বহুবিবাহ। আর তাঁর অনুবাদ নাটকগুলির মূল প্রসঙ্গ রোমান্টিক প্রেম ও পত্নীলাভ। রামনারায়ণের কালে বাংলাদেশের দর্শকদের মনে প্রণয় কাহিনীর শোনাবার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে। সাহিত্যে এই রসপিপাসা মেটানোর জন্য বঙ্কিম ইতিহাসের পটভূমিতে রোমান্টিক প্রেম কাহিনী গড়ে তুলেছেন। রামনারায়ণ একইভাবে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য থেকে সেকালের প্রেমের গল্প এনে বাংলাদেশের মানুষের রসতৃষ্ণা মিটিয়েছেন। তিনি যেসব নাটকের অনুবাদ করেছেন সেগুলির মধ্যে 'অভিজ্ঞান শকুন্তল', 'রত্নাবলী' ও 'মালতীমাধবে'র বিষয় মুখ্যত প্রেম ও স্ত্রীলাভ। কেবল 'বেণীসংহারে'ই তা নেই। আবার যে সব পুরাণ নির্ভর কাহিনী নিয়ে তিনি নাটক লিখেছেন সেখানে 'রুক্মিণীহরণ' নাটকের কাহিনীতে নায়িকার প্রেম ও স্বামীলাভ। 'স্বপ্নধন' নামে যে নাটক তিনি রচনা করেন তারও বিষয় এই প্রেম। মনে হয় তৎকালে বাংলাদেশের দর্শকরুচিই তাঁকে এই শ্রেণীর প্রণয়মূলক গল্প কাহিনী নিয়ে নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। অন্যরা সেখানে ইতিহাসের পটে কাহিনী গড়েছেন রামনারায়ণ সেখানে সংস্কৃত নাটকের প্রণয়কাহিনীকে বাংলায় অনুবাদ করে এনেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁদের লক্ষ্য একই। সেকালের ধনী রাজা ও জমিদাররা ছিলেন নাটকের পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের রুচি সেকালের নাট্যরচনাকে বেশ কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। কাজেই তাঁদের প্রণয়কথা শোনাবার জন্য বারেবারেই তাঁকে সংস্কৃত নাটকের প্রেম কাহিনী অবলম্বন করতে হয়েছে। রামনারায়ণ 'ধর্মবিজয়' নাটকে কোনো প্রেমকাহিনী রচনা করেননি বা সমাজ সমালোচনাও করেননি। এর বিষয় হরিশচন্দ্রের দান ও আত্মত্যাগ। এখানে তিনি তৃতীয় একটি বিষয় অবলম্বন করেছেন। হরিশ্চন্দ্রের দান এবং দুঃখভোগের কাহিনী এদেশে বহু পরিচিত। তিনি এই কাহিনীটি নাটকে রূপায়িত করে দর্শক মনোরঞ্জন এবং তারই সঙ্গে একটা মূল্যবোধকে একালের মানুষের জন্য বড় করে দেখাতে চাইলেন। সত্যরক্ষা নিজের জীবনের সব সুখ শান্তির চেয়েও বড়। রাজা

হরিশচন্দ্রে সত্যরক্ষার কাহিনীকে এইভাবে তিনি নিজের কালের মানুষের মনে মূল্যবোধ জাগ্রত করবার জন্য ব্যবহার করলেন। কথার মূল্য, সত্যরক্ষার জন্য ত্যাগ স্বীকার ও অশেষ দুঃখভোগ — এসব সম্ভবত মানুষের নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় বলে তিনি ভেবেছিলেন। তাঁর নাটকগুলির যে একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল তা 'নবনাটকে'র শেষে সূত্রধারের উক্তিতে পাওয়া যায়। 'উভয়সংকটে'র শেষেও এরকম উদ্দেশ্য স্পষ্ট। সুতরাং রামনারায়ণকে আরও একটি বিশেষ অর্থে সমাজমনস্ক বলা যায়। তিনি কিছুটা সেকালের রুচি অনুসারে নাটক লিখেছেন কিছুটা আবার সে রুচিকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তিনি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদগুলিতে দর্শকদের জন্য প্রেমকাহিনী পরিবেশন করেছেন আবার 'ধর্মবিজয়' নাটকে একটা উচ্চ নৈতিক আদর্শ গড়ে তুলেছেন, সামাজিক নাটকগুলিতে সমাজের প্রচলিত কিছু কুপ্রথার দোষ দেখিয়ে মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন। সুতরাং রামনারায়ণের নাট্য চেতনাকে যদি আধুনিক অর্থে প্রগতিশীল বলতে অসুবিধা হয় তাহলেও সেকালের পরিবেশে প্রাগ্রসর বলা অসঙ্গত হবে না। এখানেও তাঁর ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করতে হয়। অবশ্য তাঁরই কালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বা দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে নাট্যচেতনা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, রামনারায়ণের মধ্যে তা ছিল না। এখানে রামনারায়ণের সীমাবদ্ধতা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেভাবে তার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে তাঁর কালের বৃদ্ধদের নারী লিপ্সা স্বরূপ উদঘাটন করেছেন, রামনারায়ণের পক্ষে ততদূর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর চেতনা মুধুসূদন বা দীনবন্ধুর মতো এতখানি বিস্তৃত নয়। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাকে নাটকের বিষয় করেছেন। এই নাটকে তিনি ইংরেজ শাসকের প্রজা পীড়নের চিত্র দেখিয়েছেন এবং দরিদ্র কৃষক শ্রেণীকে নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দাঁড় করিয়েছেন। এই রাজনৈতিক চেতনার বিস্তার তাঁর নাটকে দেখা যায় নি। সুতরাং বলা যায় রামনারায়ণের সমাজচেতনা কৌলীন্য ও বহুবিবাহের সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রামনারায়ণ তাঁর শক্তির একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে দাঁড়িয়ে তাঁর যুগের রুচিকে অনুসরণ করেছেন এবং কিছুটা আবার মূল্যচেতনা গড়ে তুলতেও চেয়েছেন। তাঁর নাটকেই প্রথম বাংলার নারীসমাজের বেদনা ফুটে উঠেছে। সে চিত্রণের পিছনে একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্যও আছে। সেদিক থেকে তাঁর চিন্তাকে প্রাগ্রসরই বলা যায়। তবু রামনারায়ণ প্রধানত যুগের রুচি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং যুগের অবস্থানের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সেখানেই তাঁর সীমা।

নির্দেশিকা

১। অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, জেনারেল, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ - ১৮

২। ঐ পৃঃ - ১৮